তৃতীয় অধ্যায়

উভলিঙ্গত্ব

১৮৪৩ সাল। সেলসবুরির অধিবাসী ২৩ বছরের লেভি সুয়েদাম নগর নির্বাচকদের কাছে স্থানীয় নির্বাচনে হুইগের[1] প্রার্থী হিসেবে ভোট দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সাথে সাথেই তিনি বিরোধী দল থেকে ঘোরতর সমালোচনার সম্মুখীন হলেন। সমালোচনার কারণটি আজকের যুগে শুনলে হয়তো অনেকেরই অবাক লাগবে। না সমালোচনার পেছনে লেভি সুয়েদামের কোন দুর্নীতি, চারিত্রিক দুর্বলতা কিংবা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অযোগ্যতা বা এই ধরনের কিছু ছিলো না। বিরোধী দলের প্রধান আপত্তি ছিলো - লেভিকে দেখলে যতটা পুরুষসুলভ মনে হয়, তার চেয়ে বেশী নারী সুলভ। আর সে সময় নারীদের কোন ভোটাধিকার ছিলো না। কাজেই লেভি সুয়েদামকে 'নারী' প্রমাণ করতে পারলেই হয়তো 'কম্ম সাবার'। নির্বাচকেরা এই দ্বন্দের সুরাহা করতে একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসলেন। বিজ্ঞ ডাক্তার উইলিয়াম বেরী সুয়েদামের দেহে লিঙ্গ এবং অন্ডাশয়ের অস্তিত্ব সনাক্ত করে রায় দিলেন লেভি সুয়েদাম পুরুষ। কাজেই লেভি ভোট দেয়ার যোগ্য। লেভি সুয়েদামের ভোটে হুইগ নির্বাচনে জিতলো এক ভোটের ব্যবধানে।

কিন্তু কিছুদিন পরে ডাক্তার উইলিয়াম বেরী লেভি সুয়েদামকে পরীক্ষা করতে এসে হতভম্ব হয়ে দেখেন তার নিয়মিত মাসিক হয়, এবং তার উন্মুক্ত যোনীদ্বার রয়েছে। তার কাঁধ মেয়েদের কাঁধের মতই অপ্রশস্ত, নিতম্ব মেয়েদের মতই ভারী। শুধু তাই নয়, লেভি সব সময়ই একটু রঙ চঙ্গা কাপড় চোপড় পছন্দ করতেন, কায়িক শ্রম অপছন্দ করতেন ইত্যাদি। তার এই 'মেয়েলী বৈশিষ্ট্যগুলো'[2] ডাক্তারের চোখে ধরা পড়ে যাবার পরে তিনি আবারো ভোটের অধিকার হারিয়েছিলেন কিনা তা কেউ বলতে পারে না[3]। ফলাফল যাই

---

[1] One of the political party in the United States from about 1829 to 1856, opposed in politics to the Democratic party.

[2] উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতকের ডাক্তারদের মাথায় 'সেক্স' এবং 'জেন্ডারের' মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলো না।

[3] Two Sexes Are Not Enough, Anne Fausto-Sterling, NOVA Online, http://www.pbs.org/wgbh/nova/gender/fs.html , Also see Sexing the body, Anne Fausto-Sterling, পুর্বোক্ত।

হোক না কেন লেভি সুয়েদাম কিংবা মারিয়া প্যাতিনোর মত (পুর্ববর্তী অধ্যায় দ্রঃ) ঘটনাগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে মানুষকে কেবল 'নারী' এবং 'পুরুষ' এই দুইভাগে বিভক্ত করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অনেকক্ষেত্রেই খুব সরল। যেখানে বিভক্তি এত স্পষ্ট নয়, সেখানে জোর করে লিঙ্গ আরোপকরণ সমস্যা কমায়নি, বরং আরো জটিল করে তুলেছে।

আমি আগের অধ্যায়ে রূপান্তরকামিতা নিয়ে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। বলেছিলাম, সমকামিতা, উভকামিতা, উভকামের সমকামিতা, রূপান্তরকামিতার মত যৌনপ্রবৃত্তিগুলোকে ঢালাওভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' অভিধায় অভিহিত করার আগে আমাদের আরেকটিবার চোখ মেলে প্রকৃতির দিকে তাকানো উচিৎ। এরপর সামগ্রিকভাবে বোঝা উচিৎ যৌনতার উদ্ভবকে। প্রানীজগতের একেবারে গোড়ার দিকে কিছু পর্ব হল - প্রটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটেরেটা, প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা। এই সমস্ত প্রাণিদের বেশিরভাগই উভলিঙ্গ বা হার্মাফ্রোডাইট (Hermaphrodite)[4], কারণ এদের শরীরে স্ত্রী ও পুরুষজননাঙ্গের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এদের জন্য উভলিঙ্গত্ব কোন শারীরিক ত্রুটি নয়, বরং এটি পুরোপুরি 'প্রাকৃতিক'। এরা এদের উভলিঙ্গত্ব নিয়েই স্বাভাবিক বংশবিস্তারে সক্ষম[5]। অর্থাৎ, যে যৌনতার বিভাজনের জন্য আমরা যৌনপ্রজরা আজ গর্ববোধ করি, অবলীলায় অন্যদের 'অ্যাবনরমাল', 'আননেচারাল'- এর তকমা এঁটে দেই- গোড়ার দিকে কিন্তু প্রকৃতিতে যৌনতার সেরকম কোন সুস্পষ্ট বিভেদ ছিল না। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, মানব সমাজেও উভলিঙ্গত্ব বিরল নয়। প্রাচীন গ্রীসে সমকামিতা, প্রাচীন রোমে খোজা প্রহরী (eunuch), নেটিভ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে 'দ্বৈত সত্তা' (two-spirits), আরব ও পার্সিয়ায় 'বার্দাশ' এবং ভারতবর্ষে 'হিজড়া'দের অস্তিত্ব সেই সাক্ষ্যই দেয়। এ ছাড়া আছে ভারতের কোতি, ওমানের জানিথ, ইন্দোনেশিয়ার লুডরুক বান্টুট, মাসরি এবং রায়গ, মালয়শিয়ায় আহকুয়া, বাপুক, পোনদান কিংবা নাকনিয়া। তুরস্কে নসঙ্গা, মুস্তাক্‌নেৎ, আরবের মুখান্নাথুন, নেপালের মেটি, থাইল্যান্ডের কাথোই, চিনের তাংঝি, মালাগাসির তসিকাত্, মিশরের খাওয়াল, অ্যাঙ্গোলার চিবাদোস্, কেনিয়ার ওয়াসোগা, পর্তুগালের জিম্বাদা, পলিনেশিয়ার ফাফাফিনি, মেক্সিকোর জোতো/পুতো, ব্রাজিল এবং ইসরায়েলের ত্রাভেস্তি এবং ত্রান্সফরমিস্তা সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা রূপান্তরকামী কিংবা উভলিঙ্গ

[4] হার্মাফ্রোডাইট শব্দটি এসেছে গ্রীক উপকথা থেকে। হার্মাফ্রোডিটসও ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের একজন দেবতা। তার বাবার নাম ছিল হার্মেস, আর মা ছিল আফ্রোডাইট। একদিন প্রস্রবণে স্নানের পর তিনি উভলিংগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। হার্মাফ্রোডিটস থেকেই ইংরেজীতে হার্মাফ্রোডাইট (hermaphrodite) শব্দটি এসেছে। শ্লেষাত্মক হলেও সত্যি যে, পশ্চিমা বিশ্ব গ্রীক মিথলোজির সাথে তাল মিলিয়ে প্রানীজগতের সমন্বয় করলেও, প্রানীজগতের উভলিঙ্গত্ব কোন মিথলজি কিংবা রূপকথা নয়, বরং কঠিন বাস্তবতা।

[5] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, পূর্বোক্ত।

সত্তা[6]। হিন্দুদের পুরাণে আমরা পেয়েছি বৃহন্নলা কিংবা শিখন্ডীর মত চরিত্র। আছে শিবের অর্ধনারীশ্বর মুর্তি। পশ্চিমা বিশ্বে শেরিল চেজ, এরিক শেনিগার, জিম সিনক্লায়ারের মত ইন্টারসেক্স -সেলিব্রিটিরা বহাল তবিয়তে বাস করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা এদের অনেককেই 'অস্বাভাবিক' হিসবে চিহ্নিত করবেন। আমরা বরং 'স্বাভাবিক' মানুষদের কথা বলি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিবর্তনের দীর্ঘ পথ- পরিক্রমায় আমরা গর্বিত 'স্বাভাবিক' মানুষেরাও নিজেদের দেহেই উভলিঙ্গত্বের বহু আলামত বহন করে চলেছি - নিজেদের অজান্তেই। যেমন, নারী জননাংগ পুরুষের মত না হলেও, পুরুষের শিশ্নের অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যাকে ভগাংগুর বা ক্লাইটোরিস বলে। আবার অন্যদিকে পুরুষ শরীরে স্ফীত স্তন না থাকলেও স্তন ও স্তনবৃন্তের সুপ্ত উপস্থিতি সব সময়ই লক্ষ্যনীয়। বলাবাহুল্য, বংশবিস্তারে এসমস্ত অংগের কোন ভূমিকা নেই, তবুও আমরা এসমস্ত 'এবনরমালিটি' বহন করে চলেছি 'প্রাকৃতিক ভাবেই' - বিবর্তনের পথ ধরে। আরো কিছু উদাহরণ দেই। পুরুষ শরীরের থেকে ব্যাপক পরিমানে অ্যান্ড্রোজেন (androgen) যেমন নিঃসৃত হয়, তেমনি অল্প পরিমানে হলেও এস্ট্রোজেন (estrogen) নিঃসৃত হয়ে থাকে। এই এস্ট্রোজেন 'স্ত্রী হরমোন' হিসেবে পরিচিত। ঠিক তেমনি, মেয়েরা স্ত্রী হরমোন নিঃসরণের পাশাপাশি সামান্য পরিমানে হলেও পুরুষ হরমোনও নিঃসরণ করে থাকে। এইভাবে বিপরীত লিঙ্গের অনেক কিছুই আমরা প্রাণের উৎপত্তির ঊষালগ্ন হতে ধারণ করে চলেছি - এবং তা প্রাকৃতিকভাবেই। শুধু মানুষ কেন অনেক প্রানীর মধ্যেই এমনটি লক্ষ্যনীয়। আফ্রিকার নিশাচর মাংশাসী হায়নাদের (spotted hyena) কথা বলা যায়, যাদের নারী সম্প্রদায়কে দেখলে পুরুষ বলেই বিভ্রম হবার কথা। সায়েন্টেফিক আমেরিকানে প্রকাশিত প্রবন্ধে অধ্যাপক ডেভিড ক্রুস বলেন[7] - "The large erectile clitoris of a female spotted Hyena closely resembles a male's penis. Much like many male animals, female spotted hyenas use their clitorises in greeting displays and dominance interactions". এ ধরনের 'পুরুষাংগ সদৃশ' দীর্ঘ ভগাংগুর শুধু স্পটেড হায়নাদের মধ্যে নয়, আছে কাঠবিড়ালী সদৃশ নিশাচর প্রাইমেট 'বুশ বেবী' এবং 'স্পাইডার মাঙ্কি' এবং 'উলি মাঙ্কি'র মধ্যেও[8] । আবার বিপরীতটাও (মেয়েদের মত যৌনাংগ) দুর্লভ নয়। পুরুষ ডলফিন এবং তিমিদের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার

[6] বইইয়ের পরিশিষ্টে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি এবং সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা রূপান্তরকামী এবং উভলিঙ্গ সত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[7] David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994

[8] Joan Roughgarden, Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People, University of California Press, May 17, 2004।

মত কোন 'বহিস্থ পুরুষাংগ' দেখা যায় না। এই জলজ স্তন্যপায়ীদের (Cetaceans) কোন অণ্ডাশয়ও নেই[9] ।

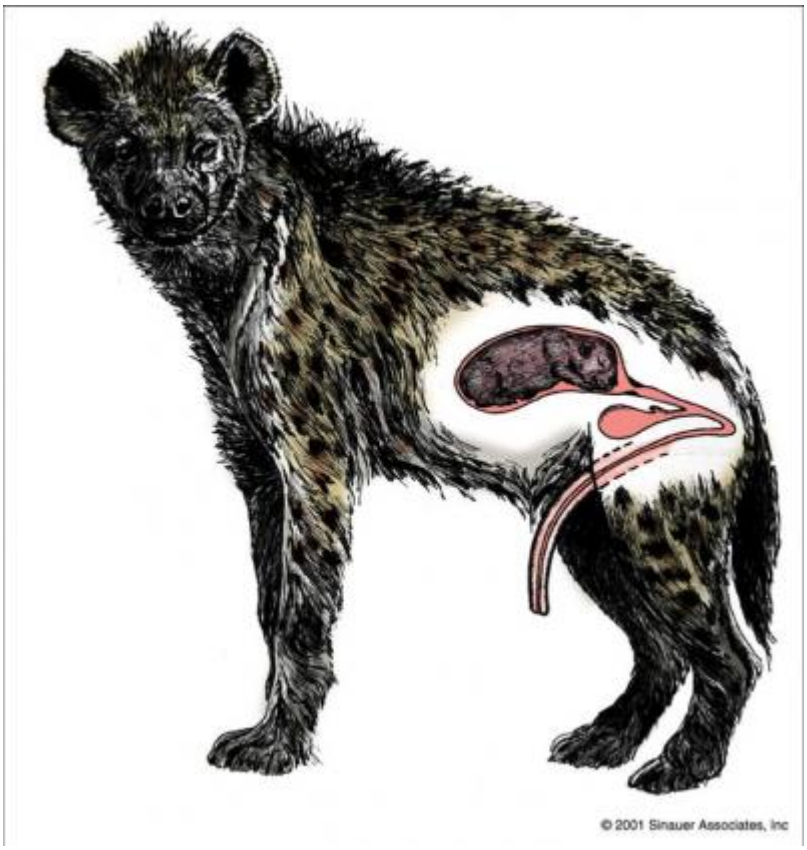

চিত্রঃ আফ্রিকার নিশাচর মাংশাসী স্পটেড হায়নাদের নারী সম্প্রদায়ের পুরুষাংগ সদৃশ দীর্ঘ ক্লাইটোরিস দেখে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন।

এ প্রসংগে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারুদের কথাও একটু বলে নেই। মেয়ে ক্যাঙ্গারুরা পেটের বাইরের দিকে লাগানো একটি থলিতে বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে - এ ধরণের ছবি আমরা বই- পত্র, সিনেমায় হর- হামেশাই দেখি। পেটের আলগা চামড়া দিয়ে তৈরি থলিটা (ইরেজীতে পাউচ) আসলে ক্যাঙ্গারুদের গর্ভাশয়ের বিকল্প; কারণ মেয়ে ক্যাঙ্গারুদের ওই থলিটা অপরিণত বাচ্চাকে এর মধ্যে রেখে ধীরে ধীরে বড় করে তুলে। অপরিণত বাচ্চাকে অন্য প্রাণীর মায়েরা নিজেদের ইউটেরাসে যেভাবে বড় করে, ঠিক সেভাবেই ক্যাঙ্গারুরা বাচ্চাকে নিজের থলিতে প্রায় নয় মাস রেখে বড় করে তুলে। কাজেই এটা হয়ত ভেবে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শুধু মেয়ে ক্যাঙ্গারুদের পেটে ওইরকম থলি থাকার কথা, ছেলে ক্যাঙ্গারুদের নয়। কিন্তু গোল বাঁধালো ইস্টার্ণ গ্রে ক্যাঙ্গারুরা। এদের

[9] Joan Roughgarden, পূর্বোক্ত।

মধ্যে পুরুষাঙ্গ এবং থলির সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, ক্রোমোজম বিশ্লেষণ করেও কিন্তু দেখা গেছে এরা স্ত্রী জননকোষ (XX) এবং পুরুষ জননকোষ (XY)- এর সমন্বয়ে আভিনব ধরণের XXY প্যাটার্ণ দিয়ে তৈরি[10] । এধরনের উভলিঙ্গ সত্তা এবং অদ্ভুতুরে ক্রোমজোম প্যাটার্ন আছে ফ্রিমার্টিন নামে এক ধরণের গরুজাতীয় প্রানীর মধ্যেও। এদের ক্রোমজমের প্যাটার্ণ XXY, XXX, XXYY, XO থেকে শুরু করে নানা ধরণের বিন্যাস এবং সজ্জা থাকতে পারে। একেক ধরণের বিন্যাস জন্ম দিতে পারে পুরুষ- মহিলার সমন্বয়ে একেক ধরণের মিশ্রণের। আবার কিছু কিছু প্রাণি আছে যাদের দেহের অর্ধেকটা পুরুষ আর অর্ধেকটা নারী; আরো স্পষ্ট করে বললে- দেহের ডানদিকটা (সাধারণতঃ) থাকে পুরুষের আর বাম দিকটা থাকে মেয়েদের। কিছু প্রজাপতি, কাকড়া, মাকড়শা, পাখি, ভালুক সহ বেশ কিছু স্তন্যপায়ী প্রানীদের মধ্যে বিজ্ঞানীরা এই "অর্ধনারীশ্বর" প্রতিমূর্তির সন্ধান পেয়েছেন। বিজ্ঞানের ভাষায়, যে সমস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরকম প্রজাতির জন্ম হতে পারে সেগুলো হল চিমারিজম (chimerism), মোজাইক (Mosaic) কিংবা গ্যানাড্রোমরফিজম (Gynandromorphism)। এ ব্যাপারটি শুধু পশু-পাখি নয়, বহু মানুষের মধ্যেও লক্ষ্যনীয়। অনেকেই হয়ত লিডিয়া ফেয়ার চাইল্ড এবং ক্যারেন কিগানের কথা মিডিয়ার দৌলতে জেনে ফেলেছেন। এরা মানুষের মধ্যে 'সিমারিজম'এর বাস্তব উদাহরণ। নিউসায়েন্টিস্ট পত্রিকার ২০০৩ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের মানুষের জন্ম হতে পারে, এবং এখন পর্যন্ত অন্ততঃ ৩০ - ৪০টি এ ধরনের 'ডকুমেন্টেড কেস' আছে[11]।

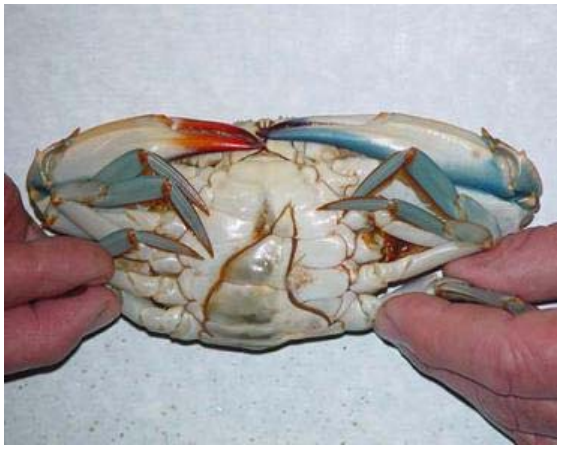

চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা প্রজাপতি, কাঁকড়া সহ বহু প্রজাতিতে উভলিঙ্গ সত্তার (গ্যানাড্রোমরফিজম) হদিস পেয়েছেন।

[10] Bruce Bagemihl, Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, Stonewall Inn Editions, 2000

[11] The Stranger Within, New Scientist vol 180 issue 2421 - 15 November 2003, p 34, On line: http://www.katewerk.com/chimera.html

শিশু বয়সে সেক্স চেঞ্জই কি উভলিঙ্গ সত্তা থেকে মুক্তির এক মাত্র সমাধান?

কিছুদিন আগেও এমনকি পশ্চিমের হাসপাতালে উভলিঙ্গ মানব শিশু (অর্থাৎ, একই দেহে নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সন্তান) জন্মালে ডাক্তারের একটাই কাজ ছিল- অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের এই 'বার্থ ডিফেক্ট' অবহিত করে 'সেক্স চেঞ্জ' (চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'সেক্স রিএসাইনমেন্ট') অপারেশন[12] করে হয় ছেলে নয়ত মেয়ে বানিয়ে ছেড়ে দেয়া। অভিভাবকেরাও যেহেতু উভলিঙ্গ সন্তান নিয়ে সমাজে ঝামেলা পোহাতে চেতেন না, তাদের কাছেও এটা একটা সবসময়ইই খুবই আকর্ষনীয় একটা সমাধান হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু আমেরিকায় ডেভিড রেইমার নামে এক রোগীর বিয়োগান্তক পরিনতি সেক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সময়ের ধ্যান ধারণা চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকটাই পালটে দিয়েছে।

ডেভিড রেইমারকে নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন দুইজন যৌনবিশেষজ্ঞ। এদের একজন হলেন জন মানি, অন্যজন মিল্টন ডায়মন্ড। চিকিৎসাবিদ্যায় এদের বিতর্ক পরিচিত হয়ে আছে 'মানি -ডায়মন্ড'/ 'জন -জোয়ান' বিতর্ক নামে [13]। জন মানি ছিলেন সেসময়কার জগদ্বিখ্যাত যৌন- বিশেষজ্ঞ; অধ্যাপনা করতেন আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষাট এবং সত্তুরের দশকে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সেসময়কার শীর্ষস্থানীয় কান্ডারী। তার ধারনা ছিলো, মানুষ এ পৃথিবীতে জন্মায় 'জেন্ডার নিরপেক্ষ' হিসেবে। জেন্ডার জিনিসটা যেহেতু পুরোটাই সাংস্কৃতিক, এর সাথে শরীরবৃত্তীয় মনস্তত্বের কোন যোগ নেই। অর্থাৎ জেন্ডার পরিচয় জন্মগত নয়, পুরোপুরি পরিবেশগত। কাজেই জন্মের সময় লৈঙ্গিক জটিলতা সম্পন্ন কোন শিশুকে যদি খুব কম বয়সেই সেক্স চেঞ্জ অপারেশনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জেন্ডার প্রদান করা হয়, তাহলে শিশুটির ভবিষ্যত মানসগঠন ওই প্রদত্ত জেন্ডারের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নিবে কোন ধরনের অসুবিধা ছাড়াই। তার তত্ত্বের সাপেক্ষে ডঃ মানি ডেভিড রেইমার নামে এক রোগীর দৃষ্টান্ত হাজির করতেন। রেইমারের সত্যিকারের নাম ধাম পরিচয় প্রকাশ না করে 'জন্' হিসবে অভিহিত করে তিনি তার গবেষণাপত্র এবং পাঠ্যবইয়ে বলেছিলেন, জন্ নামের শিশুটি জীবনের শুরুতেই একটি দুর্ঘটনায় যৌনাংগের একটা বড় অংশ হারিয়ে ফেলে। তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেক্স রিএসাইনমেন্ট সার্জারির

[12] পরিশিষ্টে সেক্সচেঞ্জ অপারেশন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

[13] The Case Of John/Joan; John Colapinto
The Rolling Stone, December 11, 1997; http://www.infocirc.org/rollston.htm

মাধ্যমে অবশিষ্ট পুরুষাঙ্গটি ছেদন করে তাকে নারীতে রূপান্তরিত করে ফেলা হয়েছিল। অভিভাবকদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল তাকে 'জোয়ান্' হিসেবে যেন বড় করা হয়। জোয়ানের অভিভাবকেরা জন মানির কথামত তাইই করে যাচ্ছিলেন। আর ডঃ জন মানিও তার এই সাফল্য ফলাও করে বৈজ্ঞানিক সাময়িকীগুলোতে প্রচার করে যাচ্ছিলেন। মানি তার পেপার আর বইগুলোতে দেখিয়েছিলেন - জোয়ান হিসবে বড় হতে জনের কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। কাজেই ডঃ মানি তর্কাতীত ভাবে সবার সামনে প্রমাণ করেছিলেন - 'মানুষের জেন্ডার নির্ধারণে প্রকৃতির কোন প্রভাব নেই, প্রভাব পুরোটুকুই পরিবেশ সঞ্জাত'। জন মানি তার তত্ত্বের 'প্রমাণের' জন্য বহু পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছিলেন।

তবে সবাই যে জন মানির কথা চোখ বুজে বিশ্বাস করছিলেন তা নয়। এমনি একজন সংশয়ী ছিলেন মিল্টন ডায়মন্ড। তিনি সে সময় কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছিলেন। তিনি এবং তার অধীক্ষক (supervisor) গবেষণার মাধ্যমে দেখালেন যে মানুষের মধ্যকার যৌনতার পার্থক্য আসলে পরিবেশ দ্বারা সূচিত হয় না, সূচিত হয় 'হরমোন' দিয়ে। অর্থাৎ, ডায়মন্ড দাবী করলেন, জন মানি যেভাবে জন্মের সময় 'জেন্ডার নিরপেক্ষ' থাকে বলে মনে করছেন, তা মোটেই ঠিক নয়। ছেলে মেয়ের পার্থক্যসূচিত ব্যাপার স্যাপারগুলো অনেক আগেই গর্ভকালীন (prenatal) হরমোনের প্রভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। নীচের ছবির মাধ্যমে মানি- ডায়মন্ডের মতাদর্শগত পার্থক্যকে তুলে ধরা যায়। বা দিকের গ্রাফটি মানির 'জেন্ডার নিরপেক্ষ' মডেলকে নির্দেশ করছে, আর ডানদিকের মডেলটি ডায়মন্ডের অনিরপেক্ষ বা ঝোঁকযুক্ত মডেলকে।

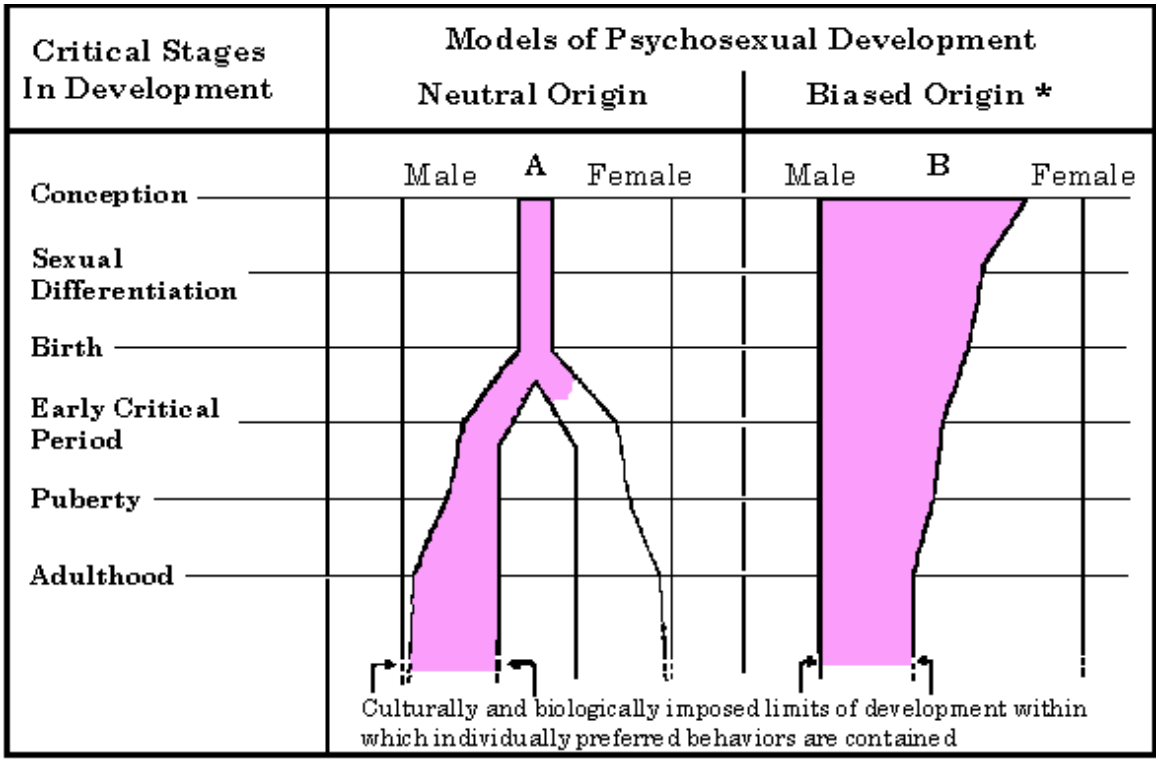

Fig. 1. Models of Psychosexual Development
A. Stemming from a psychosexual neutral dispositoin at birth;
B. Stemming from a psychosexual redisposition at birth.

শুধু ডায়মন্ডই নন, তখন ডঃ বার্নাড জুগার্ড নামে আরেক মনোবিজ্ঞানীও তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে দেখাচ্ছিলেন যে, ডঃ মানির অনুমান মোটেও সত্য নয়।

কিন্তু ডঃ মানি ডায়মন্ড কিংবা জুগার্ডের গবেষণাকে গোনায় না ধরে নিজের প্রচারনা চালিয়েই যাচ্ছিলেন। এমনকি ১৯৮২ সালের পেপারেও তিনি জন/জোয়ান কেসের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন - 'to support the connection that sex roles and sexual identity are basically learned'। জন মানির এই দৃষ্টিভঙ্গি সেসময় প্রগতিশীল মহলে দারুন সমর্থন পেয়েছিলো, এমনকি নিউইয়র্ক টাইমসের মত পত্রিকা প্রায়ই জন মানিকে উদ্ধৃত করে পাঠকদের বিশ্বাস করাতে চাইতো আমাদের প্রবৃত্তির সবকিছুই পরিবেশগত, জন্মগত কিছু নেই।

এ সময় বিবিসি থেকে জন- জোয়ান কেসের উপর ফীচার করে একটি ডকুমেন্টরী করার পরিকল্পনা করা হয়। বিবিসির মূল লক্ষ্য আসলে ছিল জন মানির কাজকে তুলে ধরা, এবং সামান্য সময়ের জন্য বিপরীত ধারণা হিসেবে ডায়মন্ডের কথাবার্তা হাল্কা ভাবে দেখানো। কিন্তু ফীচার করতে গিয়ে বিবিসির অনুসন্ধিৎসু দল এক অদ্ভুত জিনিস আবিস্কার করলেন। জন মানি তার তত্ত্বের স্বপক্ষে ডেভিড রেইমারের যে কেসকে 'সফল' হিসবে প্রতিপন্ন করে এসেছেন, সেটা মোটেই সফল নয়। তারা লক্ষ্য করলেন 'ব্রেন্ডা রেইমার' নামে বড় হওয়া মেয়েটি হাটে ছেলেদের মত, গলার স্বরও মেয়েলী নয়। অভিভাবকের সাথে কথা বলে জানা গেল, মেয়ে হিসবে বড় হতে গিয়ে তাকে নানা ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনই সে মেয়েদের পুতুল পছন্দ করতো না, মেয়েদের ড্রেস দু চোখে দেখতে পারতো না, এমনকি বাথরুমে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে চাইতো। একটা সময় 'মেয়েলী' সমস্ত কিছু করার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লো সে। দু তিন বার আত্মহত্যার প্রচেষ্টাও নিয়েছিল সে। জন মানিকে এ বিষয়ে বিবিসির সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে জন মানি সাংবাদিকদের সাথে এ নিয়ে কোন ধরনের আলোচনা করা থেকে বিরত থাকলেন।

চিত্রঃ ক) মেয়ে হিসবে বড় হতে থাকা ডেভিড রেইমার খ) বড় হয়ে পুনরায় ডেভিডে প্রত্যাবর্তন

এর পরের ঘটনা আরো নাটকীয়। একটা সময় পর ব্রেন্ডার অভিভাবকেরা তার মানসিক অস্থিরতা সহ্য না করতে পেরে তার শিশু বয়সে সেক্স চেঞ্জ সংক্রান্ত অপারেশনের কথা বলে দিলেন। সেটা শুনে ব্রেডা বুঝতে পারলো - কেন তার মেয়ে হিসবে খাপ খাইয়ে নিতে বরাবরই সমস্যা হচ্ছিলো। সে আসলে ছেলেই ছিলো বরাবরই - মানসিকভাবে। বাবা মার কাছ থেকে আসল ঘটনা শোনামাত্র সে তৎক্ষনাৎ তার ব্রেডা নাম পরিত্যাগ করে পুনরায় ডেভিড হয়ে গেল। চুল ছেটে ফেলল প্রথমেই। সার্জিকাল অপারেশন করে স্তনের আকার কমিয়ে আনলো। পরে তার অনুরোধে ডাক্তারেরা তার দেহে নতুন করে পুরুষাঙ্গ

পুনঃস্থাপিত করলো, এমনকি পরবর্তীতে জেন নামে চমৎকার একটি মেয়ের সাথে পরিনয়সূত্রে পর্যন্ত আবদ্ধ হয়ে পড়লেন ডেভিড।

এদিকে মিল্টন ডায়মন্ড এই ঘটনা লোকমুখে জানতে পেরে তার সাথে একসময় দেখা করেন, এবং সব কিছু নিজের চোখে দেখে হতভম্ব হয়ে যান। তিনি ডেভিডকে অনুরোধ করেন ভবিষ্যত রোগীদের কথা ভেবে তিনি যেন তার ঘটনা মিডিয়ায় প্রকাশ করেন। ডেভিড প্রথমদিকে অস্বীকৃতি জানালেও পরবর্তীতে রাজী হন এবং ১৯৯৭ সালে মিল্টন ডায়মন্ড ডেভিড রেইমারের সুপারভাইজিং সাইক্রিয়াট্রিস্ট কেইথ সিগ্মুন্ডসনের সাথে মিলে একটি পেপার প্রকাশ করলে ডেভিডকে নিয়ে সমস্ত জারিজুরি জনসমক্ষে ফাঁস হয়ে যায়। ঠিক একই সময়ে বিজ্ঞান লেখক জন কলাপিন্টো রোলিংস্টোন ম্যাগাজিনে ডেভিড রেইমারকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ[14] লিখেন এবং পরবর্তীতে সেটিকে আরো বিবর্ধিত করে একটি বই রচনা করেন - 'As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl' শিরোনামে[15]।

ডেভিডের এই ঘটনা একাডেমিক জগত শুধু নয়, সাধারণ মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা বদলে দারুনভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ডায়মন্ড জন মানির তত্ত্বের মূল ভিত্তি পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দেন আর প্রমান করেন যে, কারো মনোযৌনতার ক্যানভাস 'নিরপেক্ষ' হয়ে জন্মায় না[16]। শুধু তাই নয়, পুরুষাঙ্গ কিংবা ক্লাইটোরিসের কিংবা আকার, আকৃতি কিংবা 'বিকৃতি' দেখে চিকিৎসকদের তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্তে 'সেক্স চেঞ্জ' রোগীর পরবর্তী জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তবে অনেকেই মনে করেন যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে মানি এবং অন্যান্য 'বিশেষজ্ঞ'দের ভুলের পেছনে প্রধান কারণ ছিলো বিজ্ঞানমনস্ক যৌনসচেতনতার অভাব। কারণ, তারা সজ্ঞাতভাবে ধরেই নিয়েছিলেন -

১। প্রকৃতিতে শুধুমাত্র দুইটি সেক্স থাকবে - নারী এবং পুরুষ।
২। প্রকৃতিতে শুধুমাত্র 'হেটোরোসেক্সুয়ালিটি' বা বিষমকামীতাই 'স্বাভাবিক'।
৩। জন্ম মূহূর্তেই হার্মাফ্রোডাইট বা মিশ্রিত যৌনতা সম্পন্ন শিশুর জেন্ডার পরিবর্তিত করে দিয়ে মানসিক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষ তৈরী করা যায়।

---

[14] "The True Story of John/Joan", Colapinto, John, Rolling Stone, 1997, pp. 54-97.
[15] As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl, John Colapinto, Harper Perennial. ISBN 0-06-092959-6. Revised in 2006
[16] According to Dr. Diamond, far from being sexually neutral, the brain was infact prenatally generated. For Details, check, Clinical implications of the organizational and activational effects of hormones, Milton Diamond, Hormones and Behavior 55 (2009) 621–632.

ডেভিড রেইমারের বিয়োগান্তক পরিনতি[17] ডাক্তারদের এই সনাতন মনমানসিকতাগুলো বদলানোর পেছনে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলেছে। আগে মনে করা হত, মানুষের প্রবৃত্তি কিংবা জেন্ডারর গঠনে জিন কিংবা হরমোনের কোন প্রভাব নেই, পুরোটাই পরিবেশ নির্ভর। কিন্তু রেইমারের ঘটনার পর এই সংক্রান্ত চিন্তাধারা অনেকটাই বদলে গেছে [18]। এর প্রভাব পড়েছে নারীবাদী, সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামীদের আন্দোলনেও। নর্থ আমেরিকান ইন্টারসেক্স সোসাইটি শিশু বয়সে সেক্স চেঞ্জ অপারেশনের তীব্র বিরোধিতা করে মতামত ব্যক্ত করে যে, ডেভিড রেইমারের বিয়োগান্তক দৃষ্টান্ত থেকে সামাজিক জটিলতাগুলো বুঝতে ডাক্তারদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। তাদের মতে, একটি শিশু বড় হয়ে যখন নিজের জেন্ডার আইডেন্টিটি সচেতন হয়ে উঠে, তার আগে 'সেক্স অপারেশন' করা আসলে শিশু নিপীড়নের সমতুল্য। যৌনতা পরিবর্তনের চেয়ে যেটা আরো বেশী দরকার সেটা হল - নারী- পুরুষের বাইরেও অন্যান্য লৈঙ্গিক পরিচয় এবং যৌনতাগুলো সম্পর্কে জনসচেততনা এবং এগুলোর সামাজিক স্বীকৃতি। এটাই এখন যুগের দাবী।

কেমন আছে বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানবেরা?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা আর কলমজীবী বুদ্ধিজীবীরা যেমন যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে সমকামীতার স্বীকৃতি নিয়ে ভাবিত নয়, তেমনি ভাবিত নয় 'হিজড়া'[19] নামে কথিত বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানবদের সমস্যা কিংবা তাদের অধিকার নিয়ে। উভলিঙ্গ মানবরা সমাজে অপাংক্তেয়, পরিত্যক্ত। বাংলাদেশে উভলিঙ্গ মানবদের সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ বলে অনুমিত হয়[20]। তবে এই সংখ্যাটি নিয়ে বিতর্ক আছে। কারণ অপ্রকাশিত উভলিঙ্গ মানবদের সংখ্যা বের করা কঠিন। আর্থিক সঙ্গতি যে সমস্ত পরিবারে আছে তাদের অনেকেই বিভিন্ন উপায়ে এই পরিচিতি সযত্নে ঢেকে রাখতে পারেন বলে বাইরের মানুষ তা অনেক সময়ই জানতে পারে না। যে সমস্ত জায়গায় লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে পরিচিতি আর ঢেকে রাখা যায় না কিংবা বাইরে থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন তাদের সামনে আর কোন উপায় খোলা থাকে না। কেবল তখনই তারা 'হিজড়া' হিসেবে সমাজে

---

[17] ডেভিড রেইমার পরবর্তীতে ভাইয়ের মৃত্যু, নিজের বিবাহ বিচ্ছেদ এবং চাকরীগত সমস্যা সহ নানা কারনে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। ডেভিডের অভিভাবকেরা ডেভিডের এই বিয়োগান্তক পরিণতির জন্য জন্ মানির সারা জীবনের ভুল চিকিৎসাকে দায়ী করেছেন।

[18] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট: মানব প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলো কি জন্মগত নাকি আচরণগত?

[19] হিজড়া শব্দটি আমাদের দেশে খুব তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় বলে আমি তাদের বোঝাতে এই বইয়ে ' উভলিঙ্গ মানব' শব্দটি চয়ন করেছি। তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুল শব্দটিই বহাল রেখেছি বাস্তবতা বিবেচনায়। যেমন হিজড়া- পল্লী, হিজড়া সমাজ ইত্যাদি। তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিজড়াদের সবাই বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে ' উভলিঙ্গ' নাও হতে পারে, অনেকেই হয়তো কেবল মানসিকভাবে রূপান্তরকামী।

[20] হিজড়া: প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালের এক দুর্ভাগা শিকার, রণদীপম বসু, মুক্তমনা।

আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয় এবং পরিবার থেকে বের হয়ে যেতে হয়। রাজধানী ঢাকাতে উভলিঙ্গ মানবের সংখ্যা প্রায় পনের হাজার বলে মনে করা হয়[21]।

কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার হলেও বেঁচে থাকার তাগিদে উভলিঙ্গ মানবরা তৈরী করেছে নিজেদের এক নিজস্ব জগৎ। সেখানেই তারা যায়, যেখানে তাদের নিজস্ব জগতটা নিজেদের মতো করেই সাজায়, অব্যক্ত বেদনাগুলো ভাগাভাগি করে নেয় নিজেদের মধ্যেই। তারা নিজেরা বসবাসের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তৈরী করে হিজড়া পল্লী। 'পল্লী' মানে হচ্ছে আসলে 'হিজড়াদের বস্তি' যেখানে সংঘবদ্ধ হয়ে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করতে পারে উভলিঙ্গ মানবরা। যেখানে তাদের নিজস্ব সমাজ, নিজস্ব নিয়ম, নিজস্ব শাসন পদ্ধতি, সবই ভিন্ন প্রকৃতির। কোথাও কোন বাড়িতে কোন উভলিঙ্গ সন্তান জন্মের খবর পেলেই তারা দল বেধে চলে যায়, বাড়ির সামনে নাচ গান করে, তারা শিশুটিকে নিজেদের পল্লীতে নিয়ে আসতে চায়। অনেক সময় পরিণত বয়সেও অনেকে হিজড়া-পল্লীতে যোগদান করে। দেখা গেছে যে অসচ্ছল নিম্নশ্রেণীর পরিবার থেকেই বাইরে বেরিয়ে যাবার প্রবণতা বেশি। তবে যে সময়ই বা যেখান থেকেই যোগদান করুক না কেন, তাদের সাদরে হিজড়া সমাজে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অন্যান্য উভলিঙ্গ মানবেরা আগামী দিনের সহচরী তাদের বরণ করে নেয়। এরা নতুন সাথীকে কখনোই ভুলে না, বরং উৎফুল্ল হয় আরেকজন সঙ্গী বাড়ছে বলে। অনেক সময় নানা কারণে পল্লীতে যোগদান করতে ইচ্ছুক রূপান্তরকামী কিংবা উভলিঙ্গ মানবদের পথ দেখিয়ে তারাই নিয়ে যায় তাদের নিজেদের পল্লীতে, শেখায় তাদের নিয়ম কানুন। যে সমস্ত উভলিঙ্গ মানবরা শারীরিকভাবে পুরুষ, কিন্তু মানসিকভাবে নারী স্বভাবের সে সমস্ত উভলিঙ্গ মানবদেরকে পল্লীতে ডাকা হয় 'অকুয়া' হিসবে। অন্য দিকে যে সমস্ত উভলিঙ্গ মানবরা শারীরিকভাবে নারী, কিন্তু মানসিকভাবে পুরুষ, তাদের বলা হয় 'জেনানা'। এছাড়া সামাজিক প্রথার শিকার হওয়া মনুষ্যসৃষ্ট উভলিঙ্গ মানবদেরকে (এরা আসলে রূপান্তরকামী) বলা হয় 'চিন্নি'।

হিজড়া বলে কথিত বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানবদের সামাজিক নিয়মকানুনগুলো ভিন্ন প্রকৃতির। রাজধানীর প্রতিটি এলাকায় একজন করে সর্দার থাকে। তারা সাধারণ উভলিঙ্গ মানবদের নিয়ন্ত্রণ করে। রাজধানীতে পাঁচ গুরুর আওতায় প্রায় পনের হাজার 'হিজড়া' রয়েছে। একজন উভলিঙ্গ মানবের কাছে তার রক্তের সম্পর্ক বড় নয়। রক্তের চেয়ে অনেক বড় হচ্ছে গুরু শিস্য সম্পর্ক। শিস্যের কাছে গুরুই সব। দলে ভিড়ে যাবার পর সে গ্রহণ করে তার পছন্দমত কোন বয়স্ক উভলিঙ্গ মানবের শিষ্যত্ব। সর্দারের বা গুরুর আদেশ

[21] পূর্বোক্ত।

ছাড়া কোনও দোকানে কিংবা কারও কাছে হাত পেতে টাকা চাইতে পারবে না। গুরুই শিষ্যদের এলাকা ভাগ করে দেয়। প্রতিটি গুরুর অধীনে ৮/১০টি দল থাকে। একটি দলে ৫/৬ জন থাকে। প্রতিদিন সকালে গুরুর সঙ্গে দেখা করে দিক- নির্দেশনা শুনে প্রতিটি দল টাকা তোলার জন্য বের হয়ে পড়ে। বিকাল পর্যন্ত যে টাকা তোলা হয়। প্রতিটি দল ওই টাকা সর্দারের সামনে এনে রেখে দেয়। গুরু ওই টাকার অর্ধেক নিয়ে নেয় আর বাকি টাকা শিষ্যরা ভাগ করে নেয়। প্রতি সপ্তাহে উভলিঙ্গ মানবদের সালিশি বৈঠক হয়। ১৫/২০ সদস্যের সালিশি বৈঠকে গুরুর নির্দেশ অমান্যকারী উভলিঙ্গ মানবদের কঠোর শাস্তি পর্যন্ত দেওয়া হয়। বেত দিয়ে পেটানোসহ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন এবং কয়েক সপ্তাহের জন্য টাকা তোলার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। জরিমানা হয় অপরাধের ধরন অনুযায়ী ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। দন্ডিত উভলিঙ্গ মানবকে তার নির্ধারিত এলাকা থেকে তুলে এই টাকা পরিশোধ করতে হয়। গুরুর এ শাস্তি উভলিঙ্গ শিস্যরা সাধারণতঃ মাথা পেতে মেনে নেয়[22]।

উভলিঙ্গত্ব - আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা

উভলিঙ্গ মানবদের ইংরেজীতে অভিহিত করা হয় হার্মফ্রোডাইট হিসেবে। সোজা বাংলায় উভলিঙ্গ। উভলিঙ্গত্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় - প্রকৃত উভলিঙ্গত্ব (true-hermaphrodite) এবং অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব (pseudo-hermaphrodite)। প্রকৃত উভলিঙ্গ হচ্ছে যখন একই শরীরে স্ত্রী এবং পুরুষ যৌনাঙ্গের সহাবস্থান থাকে। তবে প্রকৃতিতে প্রকৃত উভলিঙ্গত্বের সংখ্যা খুবই কম। বেশী দেখা যায় অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব। সাধারণতঃ ছয় ধরণের অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব দৃশ্যমান[23] - কনজেনিটাল এড্রেনাল হাইপারপ্লাসিয়া (CAH), এন্ড্রোজেন ইন্সেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম (AIS), গোনাডাল ডিসজেনেসিস, হাইপোস্পাডিয়াস, টার্নার সিন্ড্রোম (XO) এবং ক্লাইনেফেল্টার সিন্ড্রোম (XXY) । উভলিঙ্গত্বের বিভিন্ন প্রপঞ্চের উদ্ভব বিভিন্ন কারণে হয়। যেমন, মারিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে এন্ড্রোজেন ইন্সেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম - শিশু বয়সে তার দেহকোষ এন্ড্রোজেন সনাক্ত করতে পারে নি। এ ছাড়া ক্রোমজমের বৈসাদৃশ্যতার কারণেও উভ্লিঙ্গত্ব প্রকাশ পেতে পারে। যেমন ক্লেইনফ্লেয়ার সিন্ড্রোমের

[22] হিজড়া সম্প্রদায় তৃতীয় লিঙ্গ নয় কেন?, ঝর্না রায়, সাপ্তাহিক ২০০০ বিশেষ প্রতিবেদন, নভেম্বর ১৪, ২০০৮।
[23] সারণী ৩.১ দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রে পুরুষ শিশু একটি বাড়তি ক্রোমোজম নিয়ে জন্মায় (অর্থাৎ, XY এর বদলে XXY))। টার্নার সিন্ড্রোমে আবার মেয়ে শিশুর একটি এক্স ক্রোমোজম কম থাকে (XO)। এ গুলো ছাড়াও বিশেষ কিছু হরমোনের অভাবে উভলিঙ্গত্ব প্রকাশ পেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে জীবন ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকলেও অধিকাংশ প্রকরণগুলোই চিকিসাবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ক্ষতিকর কিছু নয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে সত্যিকার জীবন ঝুঁকি তৈরি হয়, সেগুলোতে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী চিকিৎসা করা অপরিহার্য, অন্যগুলো নিতান্তই কসমেটিক। প্রচলিত দৃষ্টিকোন থেকে উভলিঙ্গত্বকে অস্বাভাবিক বলে মনে করা হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রানীজগতের একেবারে গোড়ার দিকে কিছু পর্ব হল - প্রটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটেরেটা, প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা। এই সমস্ত প্রাণিদের বেশিরভাগই উভলিঙ্গ বা হার্মাফ্রোডাইট (Hermaphrodite), কারণ এদের শরীরে স্ত্রী ও পুরুষজননাঙ্গের সহবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এদের জন্য উভলিঙ্গত্ব কোন শারীরিক ত্রুটি নয়, বরং এটি পুরোপুরি 'প্রাকৃতিক'। প্রকৃতিতে এখনো পালমোনেট, স্নেইল এবং স্লাগেদের অধিকাংশই হার্মাফ্রোডাইট। তবে মানুষের সমাজে যেহেতু জেন্ডার ইস্যু খুব প্রবল সেহেতু উভলিঙ্গ মানবদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তারপরেও ধ্যান ধারণা সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা পাল্টেছে। পশ্চিমা বিশ্বের বহু জায়গায় ইতোমধ্যেই কেবল নারী- পুরুষ - এই দ্বিলিঙ্গভিত্তিক সমাজ ঘুচিয়ে দিয়ে বহুলিঙ্গভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে [24]। পশ্চিমে শেরিল চেজ, এরিক শেনিগার, জিম সিনক্লায়ারের মত ইন্টারসেক্স - সেলিব্রিটিরা নিজ পরিচয়ই বাস করেন। ভারতেও 'শবনম মৌসি' নির্বাচিত প্রতিনিধি হতে পেরেছেন। বাংলাদেশেই বা উভলিঙ্গ মানবরা তৃতীয় লিঙ্গ বলে বিবেচিতা হবে না কেন - যুগের দাবীর প্রেক্ষাপটে এ অতি স্বাভাবিক প্রশ্ন আজ।

সারণী ৩.১ *প্রকৃতিতে ঘটা উভলিঙ্গত্বের সবচেয়ে সাধারণ প্রকরণগুলো*

[24] উদাহরণ স্বরূপ, সম্প্রতি জীববিজ্ঞানী Anne Fausto-Sterling 'নারী' এবং 'পুরুষ' এই দুই লিঙ্গের পাশাপাশি *হার্মস* (ট্রু হার্মাফ্রোডাইট), *নার্মস* (মেল সুডো হার্মাফ্রোডাইট) এবং *ফার্মস* (ফিমেল সুডো হার্মাফ্রোডাইট) - এর প্রস্তাব করেছেন। A. Fausto-Sterling (1993). "The Five Sexes: Why male and female are not enough". The Sciences (May/April 1993): 20–24. এ ছাড়া অনলাইনে দেখুন, Two Sexes Are Not Enough, Nova Online.

নাম	কারণ	বৈশিষ্ট
কনজেনিটাল এড্রেনাল হাইপারপ্লাসিয়া (CAH)	সাধারনতঃ CYP_{2I} জিনের অনুপস্থিতি কিংবা বাধা জনিত কারণে দেহে এন্ড্রোজেনের তারতম্য ঘটে।	মেয়েদের (**XX** সন্তানের) ক্ষেত্রে 'পুরুষত্ব' বৃদ্ধির লক্ষণ যেমন - দীর্ঘ ভগাঙ্গুর দৃশ্যমান থাকে। কিছু ক্ষেত্রে দেহে লবন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে এবং জীবন মৃত্যু ঝুঁকির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ স্ট্রেস হরমোন কর্টিসোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।
এন্ড্রোজেন ইন্সেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম (AIS)	দেহস্থ কোষে 'এন্ড্রোজেন গ্রাহক'- জনিত সমস্যার ফলে উদ্ভুত।	XY সন্তানের মেয়েলী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বয়োসন্ধিকালে স্তন বৃদ্ধি পায়, নারী কাঠামোর আদলে দেহ বৃদ্ধি পায়।
গোনাডাল ডিসজেনেসিস	বিভিন্ন কারণে ঘটে, কিছু ক্ষেত্রে জেনেটিক।	XY সন্তানের জননতন্ত্র সঠিকভাবে বিবর্ধিত হয় না।
হাইপোস্পাডিয়াস	এটিও বিভিন্ন কারণে ঘটে, এর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হল এন্ড্রোজেনের তারতম্য।	মুত্রনালীর দ্বার লিঙ্গের মুখে না হয়ে নীচে গঠিত হয়। চরম কিছু ক্ষেত্রে মুত্রদ্বার লিঙ্গের একদম গোড়ায় তৈরি হতে পারে।
টার্নার সিন্ড্রোম	জন্মানোর সময় মেয়ে শিশুর একটি ক্রোমোজম কম থাকে (XO) ।	মেয়েদের জননতন্ত্রের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ডিম্বাশয় সঠিক আকারে গঠিত হয় না। গৌন জননগত বৈশিষ্ট্যগুলো অনুপস্থিত থাকে। সাধারনতঃ এস্ট্রোজেন এবং অন্যান্য বৃদ্ধিসূচক হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।
ক্লাইনেফেল্টার সিন্ড্রোম	পুরুষ শিশুর একটি X ক্রোমোজম বেশি থাকে	জননতন্ত্রের সমস্যা থেকে বন্ধ্যাত্ব সংক্রান্ত সমস্যা

নাম	কারণ	বৈশিষ্ট
	(XXY) ।	তৈরি হতে পারে। বয়োসন্ধিকালের পর স্তনের বৃদ্ধি ঘটে। টেস্টোস্টেরোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

তবে এত কিছুর মধ্যেও আশার কথা যে, বিগত নির্বাচনের (২০০৯) ভোটার তালিকায় এই প্রথম উভলিঙ্গ মানবদেরকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রশংসনীয় একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগ বিবেকবান মানুষের সমর্থনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থারও প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবু প্রায় এক লাখ উভলিঙ্গ মানবকে এবারের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিলতা এখনো রয়ে গেছে বলে জানা যায়। কেননা,

- তাদেরকে তাদের নিজের পরিচয় উভলিঙ্গ মানব হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি বা করা যায়নি; হয়েছে ছেলে বা মেয়ের লৈঙ্গিক পরিচয়ে, যেখানে যেটা সুবিধাজনক মনে হয়েছে সেভাবেই। ফলে সবকিছু থেকে বঞ্চিত এই সম্প্রদায়ের আদতে কোন সামাজিক স্বীকৃতি মেলেনি।

এ ছাড়াও প্রাসঙ্গিক যে ব্যাপারগুলো আছে, তার মধ্যে [25]

- বাংলাদেশে নারীর তুলনায় পুরুষের অনুপাত বেশী হবার কারণে আদমশুমারিতে বেশিরভাগ উভলিঙ্গ মানবকেই দেখানো হয় পুরুষ হিসেবে।
- এদের নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে নানা জটিলতা। ভিসা ফর্মগুলোতে এদের জন্য কোনো ঘর বরাদ্দ করা হয়নি। এদেরকে হয় পুরুষ কিংবা নারীর ঘরে টিক দিতে হয়, ইমিগ্রেশনে গিয়ে পড়তে হয় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি।
- বাংলাদেশে এদের জন্য পাসপোর্ট করতে হলেও পরিচয় দিতে হয় পুরুষ অথবা নারী হিসেবে।
- ভাসমান জীবনে অভ্যস্ত হওয়ায় আর স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় অনেকেই আবার পাসপোর্টও পায় না।

এই জটিলতার কারণ হচ্ছে ‘নারী’ ‘পুরুষ’ ছাড়া আর কোন লৈঙ্গিক পরিচয় আমাদের সমাজে গ্রহনযোগ্য না হওয়া বা স্বাভাবিক না মনে করার প্রবণতা। আসলে নারী-

[25] মাহবুব লীলেন, রণদীপম বসুর প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, সচলয়ায়তন।

পুরুষের বাইরে অন্য লিঙ্গগুলোও সমাজে পরিচিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজ। পশ্চিমে সতাতন লিঙ্গের বাইরে অন্যান্য লৈঙ্গিক স্বীকৃতি অল্প হলেও কিছুটা আদায় করা গেছে। বহু ইন্টারসেক্স সেলিব্রিটি সেখানে নিজ পরিচয়ই সমাজে বাস করেন। এমনকি ভারতেও উভলিঙ্গ সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি পাওয়া গেছে। আমাদের দেশে উভলিঙ্গ মানবদের প্রাপ্য অধিকার ও মানুষ হিসেবে পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ আইনের দরকার হয়ে পড়েছে আজ, প্রয়োজন হয়েছে সনাতন লৈঙ্গিক বলয় ভাঙ্গার। এজন্যেই আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে 'হিজড়া'দেরকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মানবিক দাবীটাও।

কয়েকটি সংগঠন খুব ছোট্ট পরিসরে হলেও বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানব সমাজের জন্য কাজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, সুস্থ জীবন, বাঁধন হিজড়া সংঘ, লাইট হাউস, দিনের আলো ইত্যাদি সংগঠনের নাম উল্লেখ্য। এদের কার্যক্রম ততোটা প্রচারের আলোতে না এলেও এইডস প্রতিরোধসহ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রমে এরা যুক্ত রয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু এদের কাজকর্মের পেছনে রাষ্ট্রের কোন অনুদান নেই। আসলে উভলিঙ্গ মানবদের সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা এবং সমাধান করার জন্য কোন রাষ্ট্রীয় বাজেটও বরাদ্দ নেই। তাই রাষ্ট্রের কাছে উভলিঙ্গ মানবদের প্রধান দাবি আজ, তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি। কেননা এই লিঙ্গস্বীকৃতি না পেলে কোন মানবাধিকার অর্জনের সুযোগই তারা পাবে না বলে অনেকে মনে করেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, সাড়া বিশ্ব জুড়েই এই দাবী কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।